পরশুরামের ‘‘মহাবিদ্যা’

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

ছোটো গল্প না একাঙ্ক নাটক?

আঙ্গিকের দিক দিয়ে পরশুরামের ‘‘মহাবিদ্যা’’ গল্পটি পুরোপুরি একাঙ্ক নাটক। এ গল্পে কোন বিবরণ অংশ নেই। আছে শুধু সংলাপ, আর মঞ্চনির্দেশ এর মতো কিছু সংক্ষিপ্ত কাটা কাটা বাক্য।
অথচ এটিকে নাটক হিসাবে অভিনয় করা যাবে না - করলেও জমবেনা। গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত ‘নাটকীয়’ কিছুই এতে ঘটে না। ঘটনা (অ্যাকশন) হলো নাটকের প্রাণ। গল্পটিতে তারই একান্ত অভাব। তারপর, ছোট্ট একটি গল্পে (‘গল্পসমগ্র’য় মোট সাড়ে ছ’ পাতা, তারমধ্যে হেডপিস -এর ছবি আর গল্পের চরিত্রদের পরিচয়লিপিতেইগেছে দেড় পাতা) চরিত্র আছে কুড়িটিঃ অনেক পঞ্চাঙ্ক নাটকেও যা থাকে না! কোন চরিত্রেই দু-চার কথার বেশি বলার (বা বিশেষ কিছু করার) সুযোগ নেই।
তবে গল্পের পরিস্থিতিটা নাটকীয়। জগদ্‌গু আসার আগে তাঁকে নিয়ে যে সব কথা হয় তাতে নাটকীয় উপাদান আছে। জগদ্‌গুর আসল পরিচয় কী? তিনি ভান্ডারলুট না ফ্রাঙ্কেনষ্টাইন? শয়তান না সুপারম্যান? তিনি কেথা থেকে এসেছেন - তুর্কি? কোথায় উঠেছেন বেঙ্গল ক্লাব না পগেয়া পার্টি? তাঁর লেকচারের খরচ কে জোগাচেছন,বিলাতের কোনো ত্রে ারপতি না ইউনিভারসিটি? ই - কাতলা আর চুনোপুঁটির এই সংযোগ বেশ মজার। এছাড়া মনে হয় ভান্ডারলুট নামটায় একটা মজার খেলা আছে। ভান্ডারবিল্‌ট্‌ মার্কিন দেশের এক নাম করা ব্যবসাদার পরিবার। এর সঙ্গে বাঙলা প্রবাদ, ‘মারি তো গন্ডার লুটি তো ভাণ্ডার বেশ খাপ খেয়ে যায়।
পুরোপুরি সংলাপ - নির্ভর হলেও ‘‘মহাবিদ্যা’’ কিন্তু ছোটো গল্পই। এখানে ঘটনার ঘনঘটা থাকবে না - এমনই স্বাভা বিক।
পরশুরামের লক্ষ্যই ছিল ১৯২০-র দশকের কলকাতার পটভূমিতে ঝিজোড়া তঞ্চকতার একটুকরো ছবি হাজির করা। বা, এলাকাটা একটু বাড়িয়ে, গোটা পূর্বভারতকে ধরা যেতে পারে। কিন্তু তার দরকার নেই। গল্পের মধ্যে যে সব বাড়ি ও মহল্লার নাম আছে (বেঙ্গল ক্লাব, গেঁড়াতলা, পগেয়াপটি) তার সবই কলকাতায় ঐ সময়ে বেশ পরিচিত নাম আলাদা করে বলা না থাকলেও ‘ইউনিভারসিটি’ বলতে নিশ্চয়ই কলকাতা ঝিবিদ্যালয়কেই বোঝাচেছ- জন্ম ইস্তক টাকার অভাব যার নাকি নিত্যসঙ্গী। চরিত্রদের বেশির ভাগই বাঙালি, বাকিরাও এই কসমোপলিস এর বাসিন্দা - কেউ মহারাজ, কেউ ব া নবাব, বাকিরা জমিদার, ব্যবসাদার ও কাগজের সম্পাদক, অথবা গুন্ডারদলের সর্দার, জমাদার ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে মনে করিয়ে দেওয়া ভালো যে, ঘটনার পটভূমি খোদ ব্রিটিশরাজের আমল।
নামকরনের ব্যাপারে সর্বদাই বেশ যত্ন নিতেন পরশুরাম। এই গল্পেও, শুধু নামের মধ্যে দিয়েই তাঁর ঈঙ্গিত বিদ্রুপ ফুটে ওঠে ঃ হোমরাও সিং, চোমরাও আলি, সরেশচন্দ্র, নিরেশচন্দ্র কাঙালিচর - নামেই লোকগুলোকে চেনা যায়। একটু খেয় াল করলে বোঝা যায় ঃ কেন একজন ইংরেজ বনিকের নাম মিষ্টার গ্র্যাব (গুজরাম্নানে ছিনিয়ে নেওয়া), কেনই বা কাগজের সম্পাদকের নাম মিষ্টার হাউলার (Howler বলতে বোঝায় মারাত্মক ভূল)। দিশি বণিকের নাম রূপচাঁদ (একই সঙ্গে র দপো আর চাঁদি দু - এরই কথা আসে), দেউলের নাম লুটবেহারী (ইনি বোধহয় বাঙালি নন, কিন্তু বড়মাপের লুট করতে গিয়ে দেনার দায়ে পড়ে, শেষে দেউলিয়া হয়েছেন)। গুন্ডা সর্দারের নাম তো গাঁট্টালাল হতেই পারে, তবে পেশায় জমাদ ার অথচ পদবি তেওয়ারী (ত্রিবেদী) এতে যেন মজাটা আরও খোলে। শহরে এলে বামুনও শূদ্রের কাজ করতে পারে। শূদ্রেরও বামুন সাজতে বাধা নেই।

কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আর স্কুলের শিক্ষক - এঁরা শুধু দুই শ্রেণীর লোক নন (একজন বসেন দ্বিতীয় শ্রেণীতে, অন্যজন চতুর্থ-য়) নাম বলার ভেতর দিয়েই সামাজিক ব্যবধান ফুটে ওঠে ঃ প্রফেসর গুই আর পদবিহীন গব্বের ১।

ইওরোপীয় অলঙ্কার শাস্ত্রে এক ধরনের কথার খেলার নাম ঃ euphemism । সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে এটি বোধ হয় বক্রোক্তি-র আওতায় পড়বে। তবে আলাদা করে এর নাম দেওয়া হয়েছে ঃ মঞ্জুভাষন। ''মহাবিদ্যা'' শব্দটি এর বেশ ভালো নমুনা। এর উৎস হলো একটি বাঙলা প্রবাদ ঃ 'চুরিবিদ্যা মহাবিদ্যা(বা, বড় বিদ্যা) যদিন া পড়ে ধরা।' এই অর্থেই শব্দটি পরশুরাম তাঁর গল্পে ব্যবহার করছেন।২ একটি উদ্ভট শ্লোকে- যার লেখকের নাম ইত্যাদি কিছুই জানা যায় না - বলা হয়েছে ঃ তৈল, শঙ্খ, দ্বিজ, বৈদ্য, জ্যোতিষী, যাত্রা, পথ ওনিদ্রা - এই কটি শব্দের আগে 'মহৎ' (মহা-) যোগ করবে না। ৩ এরকম আরও দু-একটি শব্দ আছে যার আগে 'মহা' বসলে মানেটা অন্যরকম হয়ে যায়। যেমন, 'মহামাংস' মানে নরমাংস, মহা নিদ্রা মানে চিরনিদ্রা অর্থাৎ মৃত্যু। ৪ বড়লোক হতে গেলে চোর না হলে চলে না - এই সরল সত্যটি দিয়েই গল্পের শু। জ ানতে ইচ্ছে হয়, ফরাসি নৈরাজ্যবাদী চিন্তাবিদ, পিয়ের জোসেফ প্রুধঁ (১৮০৯-৬৫)র বিখ্যাত বচন, ''সম্পত্তি হলো চুরি (জ্র Property is theft) ৫ পরশুরামের মাথায় ছিল কি না। জগদ্‌গু দেখা দেন নিতান্তই দিশি গ্রাম্য চোরের মূর্তি ধরে -- 'মাথা কামানো, গায়ে তেল, পরনে লেংটি' চোরের যা অস্ত্র, সেই সিঁধকাঠি ও আছে, তবে সেটি ডান হাতে নয়, বাঁ হাতে। তারকারন এই নয় যে মহাবিদ্বান জগদ্‌গু ল্যাটা। তিনি হাজির হয়েছেন জগদ্‌গুর ভূমিকায়, তাই ডান হাতের বরাভয় মুদ্রা দেখাতে হচ্ছে, (আবার বাঁ হাতের কারবারে সিদ্ধ - এমন ইঙ্গিত থাকতে পারে)। আর জগদ্‌গু হয়ে তিনি যখন দেখা দেন, তখন বহির্বাস হয় অন্যরকম -- 'মাথায় সোনার মুকুট, মুখে মুখোশ, গায়ে গেয়া আলখাল্লা', এরমধ্যে গেয়া আলখাল্লাটি সবচেয়ে চোকে পড়ার মতো সাধুর ভেক ধরে তবেই না ভালোভাবে চুরি করা যায়। আর তার জন্যে মুখোশ পরাও দরক ার।

বিরিঞ্চি বাবার মতো এই জগদ্‌গু দেশকালের ঊর্দ্ধে। বিরিঞ্চিবাবার মতোই ইনি বচনবাগীশঃ 'বাংলা, ইংরেজী, ফরাসী, জ াপানী, সবই আমার মাতৃভাষা, আমি প্রবীন লোক, দশ-বিশ হাজার বৎসর ধরে এই মহাবিদ্যা শেখাচ্ছি।' মহাবিদ্যার স্বর পটি তিনি ব্যাখ্যা করেন বেশ চমৎকারঃ 'বিদ্বানে বিদ্বানে সংঘর্ষ হলে একটু বাক্যব্যয় হয় মাত্র, কিন্তু মহাবিদ্যানদের ভেতর ঠোকাঠুকি বাধলে সব চুরমার। তার সাক্ষী এই ইউরোপের যুদ্ধ। অতএব মহাবিদ্বানদের একজোট হয়েই কাজ করতে হবে', প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) কারনটি অত্যন্ত সুচাভাবে বুঝিয়ে দেওয়াহয়েছে। প্রতিটি সাম্রাজ্যবাদী দেশই চোর অ ার সাম্রাজ্যের বখরা নিয়ে ঝগড়া, তার থেকেই বেধে যায় মহাযুদ্ধ -এই সার কথাটি কেমন সুচা ইঙ্গিতে বলা থাকে।

মহাবিদ্যা-র সংজ্ঞার্থ ঃ .....যাতে ঢাক পিটিয়ে কেড়ে নেওয়া যায়, অথচ শেষ পর্যন্ত নিজের মানসম্ভ্রম বজায় থাকে, লে াকে জয় - জয়কার করে - সেটা মহাবিদ্যা'। একথায় সকলেই তুষ্ট হন, কিন্তু প্রফেসর একুট গাঁইগুইকরেন (বোধহয় এর জন্যেই পরশুরাম তাঁর ঐ পদবিটি বেছে নিয়েছিলেন) ঃ কিন্তু ঐ কেড়ে নেওয়া কথাটি একটু আপত্তিজনক। দেউলে লুটবিহ ারী holier than thou সেজে জ্ঞান দেয়ঃ 'আপনার মনে পাপ আছে। তাই খটকা বাজছে। কেড়ে নেওয়া পছন্দ না হল, বলুন ভোগা দেওয়া,' গুই তাতে খেপে যান ঃ 'কে হে বেহায়া তুমি? তোমার কনশেন্স নেই? ৬ জগদ্‌গুই তখন বুঝিয়ে বলেন' 'বৎস,কেড়ে নেওয়াটা পক মাত্র। সাদাকথায় এর মানে হচ্ছে - সংসারের মঙ্গলের জন্য লোককে বুঝিয়ে সুঝিয়ে কিছু আদায় করা।'

জার্মান রণপন্ডিত কার্ল (ফিলিপ গটলিব) ফন ক্লাউসেভিৎস্ (১৭৮০ - ১৮৩১) তাঁর 'যুদ্ধ প্রসঙ্গে' বইটিতে যুদ্ধের সংজ্ঞ ার্থ দিয়েছিলেন ঃ 'অন্য উপায়ে রাজনীতিকে চালিয়ে যাওয়া ছাড়া যুদ্ধ আর কিচুই নয়' এখানে অবশ্যই 'অন্য উপায়' ম ানে সশস্ত্র উপায় (লেলিন যেমন ব্যাখ্যা করেছিলেন)৭। জগদ্‌গু যা শেখান তা এরই উল্টো পিঠঃ (অহিংস) উপায়ে যুদ্ধ চা লিয়ে যাওয়া ছাড়া রাজনীতি আর কিছুই নয়।' তবে রাজনীতির পেছনে থাকে অর্থনীতি। জগদ্‌গুর মহবিদ্যার সারকথা হলো ঃ বোকারাই যুদ্ধ করে, মহাবিদ্বানরা জনসাধারনের মাথায় গাধার টুপি পরিয়ে'ত্রোরপতি' হয়।

যারা ছোটো মার্জিনের কারবারি, নতুন গ্রাজুয়েট, বাঙলা পত্রিকার সম্পাদক ইত্যাদি দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেনীর ছাত্র তাঁরা এর থেকে কোনো ভরসাই পান না। বেচারা মাষ্টার গব্বের ও মজুর পাঁচু মিঁয়াকেও হতাশ হতে হয়। মূল বিষয়টি বুঝে নেন শুধু প্রথম শ্রেণীর ছাত্ররা। তাঁরা একটি অ্যাসোসিয়েশন খোলার সিদ্ধান্ত নেন রাজনীতিজ্ঞ মিষ্টার গুহাও তাঁদের সঙ্গে ভিড়ে যান, প্রফেসর গুঁইও তার বিবেককে মুলতুবি রেখে আবেদন করেন, 'আমাকেও নেবেন, আমি স্পীচ লিখে দেব'।

পরশুরামের মাথায় হয়তো ছিল না - ১৯২২-এ এমন ভবিষ্যদ্ দৃষ্টি থাকা বোধহয় অসম্ভব - তবু বড়লোকদের এই জোট বাঁধা দেখে এখনকার বহুজাতির কোম্পানিগুলির কথা মনে হয়। তারই এখন নয়া উপনিবেশবাদের ধারক ও বাহক। জেসি জ্যাগসন তাই বলেছিলেন, 'ওরা আর বুলেট ও (ফাঁসিতে ঝুলোনোর) দড়ি ব্যবহার করে না। ওরা ব্যবহার করে বিশ্ব ব্যাঙ্ক আর আন্তর্জাতিক অর্থতহবিল - কে'৮

পুরো গল্পটিই দিশি ও বিলিতি বড়লোক, রাজ্যের বাজার ও ক্ষমতার দালাল, আর সেই সঙ্গে অক্ষম ও পেছিয়ে পড়া লোকজনদের নিয়ে মশকরা, Lampoon । তবে এর আসল চাঁদমারি মহাবিদ্যার ছাত্ররা নয়, যারা মহাবিদ্যার প্রয়োগে বিশ্বজয় করেছে সেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। জগদ্‌গুণ্ড বলেন, 'সাধারণ বিদ্যা মোটামুটি জানা না থাকলে মহাবিদ্যায় ভাল রকম বুৎপত্তি লাভ হয় না। পাশ্চাত্য দেশে দুই বিদ্যার মনিকাঞ্চন যোগ হয়েছে। এদেশেও যে মহাবিদ্বান নেই, তা নয় - তবে মূর্খলোকে মহাবিদ্যার প্রয়োগটা আত্মসংযম বাঁচিয়ে করতে পারে না, পাশ্চাত্য দেশ এই বিষয়ে অত্যন্ত উন্নত। জরির খাপের ভিরত যেমন তলোয়ারা ঢাকা থাকে, মহাবিদ্যাকেও তেমনি সাধারন বিদ্যা দিয়ে ঢেকে রাখতে হয়। মহাবিদ্যার মূল সূত্রই হচ্ছে - যদি না পড়ে ধরা' সব শুনে লুটবিহারী বলে, 'জগদ্‌গুণ্ড নূতন কথা আর কি বলছেন। প্র্যাকটিস আমার সব জানা আছে, তবে থিওরিটা শেখবার তেমন সময় পাইনি।'

এ গল্পের চরিত্রদের দুভাগে ভাগ করা যায় ঃ বড় মাঝারি ছোটো মাপের ঠক আর অন্যদিকে ঠকানোর খোরাক। এর বাইরে একজনই দাঁড়িয়ে থাকেন, তাঁকেই সবচেয়ে দিশেহারা লাগে। তিনি প্রফেসর গুই - যদিও শেষ পর্যন্ত তিনি ঠকদের দলেই ভিড়ে যান। তবে তিনিই জগদ্‌গুণ্ডকে খুঁচিয়ে মহাবিদ্যার মূল কথাগুলো সাদা বাঙলায় বলিয়ে নিয়েছিলেন

শুধু সংলাপ নয়, প্রশ্ন - উত্তরের ঢঙটি (ক্যাটেকিজ্‌ম, catechism) এ গল্পে খুব কাজ দেয়। যেমন, রাজনীতিজ্ঞ মিষ্টার গুহা জানতে চান, 'মহাবিদ্যা শিখলে কি আমাদের দেশে সকলেরই উন্নতি হবে?' জগদ্‌গুণ্ড জানান, 'দেখ বাপু, পৃথিবীর ধনসম্পদ যা দেখছ, তার একটা সীমা আছে, বেশি বাড়ানো যায় না, সকলেই যদি সমানভাগে পায়, তবে কারও পেট ভরে না। যে জিনিস সকলেই অবাধে ভোগ করতে পারে, সেটা আর সম্পত্তি বলে গন্য হয় না। কাজেই জগতের ব্যবস্থা এই হয়েছে যে, জনকতক ভোগদখল করবে, বাকি সবাই যুগিয়ে দেবে। চাই গুটিকতক মহাবিদ্বান্ আর একগাদা মহামূর্খ'

গল্প হিসাবে "মহাবিদ্যা" হয়তো পরশুরামের সেরার দলে পড়ে না। কিন্তু একদিকে সাম্রাজ্যবাদের মূলভিত আর অন্যদিকে উপনিবেশে তার নানাধরনের ধামাধরা চরিত্রকে দু - চারটি আঁচড়ে চমৎকার আঁকা হয়েছে। বক্রোক্তিতে পরশুরাম চিরদিনই তুখোড় ঃ এগল্পে নানা সংলাপে তার সুযোগও জোটে প্রচুর। যেমন উপনিবেশের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে হাউলার মনে করেন ঃ

এদেশের লোকে এখনও মহাবিদ্যা লাভের উপযুক্ত হয় নি। আর আমাদের মহাবিদ্বানরা দেশী মহাবিদ্বানদের সঙ্গে বনিয়ে চলতে পারবেন না। মিথ্যা একটা অশান্তির সৃষ্টি হবে।

গ্রাব ঃ চুপ কর হাউলার। মহাবিদ্যা শেখা কি এদেশের লোকের কর্ম? লেকচার শুনে হুজুগে পড়ে যদি মহাবিদ্যা নিয়ে লোকে একটু ছেলেখেলা আরম্ভ করে, মন্দ কি? একটু অন্যদিকে ডিসট্র্যাকশন হওয়া ছেলের পক্ষে এখন দরকার হয়েছে।

হাউলার ঃ সাধারন বিদ্যা যখন এদেশে প্রথম চালানো হয় তখন আমরা ব্যাপারটাকে ছেলেখেলা মনে করেছিলুম। এখন দেখছ তো ঠেলা? জোর করে টেকস্‌ট্ বুক থেকে এটা - সেটা বাদ দিয়ে কি আর সামলানো যাচ্ছে?

মূল তর্কর কোনো নিস্পত্তি হয় না বটে, তবে এর খেই ধরে এক হিন্দু জমিদার আর এক মুসলমান নবাব দুটি মার্কামারা (typical) মন্তব্য করেন ঃ

খুদীন্দ্র ঃ মিষ্টার হাউলার ঠিক বলেছেন। আমারও ভাল ঠেকছে না।

চোমরাও আলিঃ ভাল - মন্দ গভর্নমেন্ট বিচার করবেন। তবে মহাবিদ্যা যদি শেখাতেই হয়, মুসলমানদের জন্য একটা আলাদা ব্যবস্থা করা দরকার।

এতসব আশকথা পাশকথার মধ্যেও স্বদেশী শিল্পোদ্যোগীদের নিয়ে কিছু বিদ্রুপ থাকে। মিষ্টার গুপ্তা (সবকিছু গুপ্ত রাখেন বলেই কি এই পদবি বেছে নেওয়া?) নতুন গ্রাজুয়েটদের ভরসা দেনঃ 'আমি টেকনিক্যাল ক্লাস খুলছি, ভর্তি হ'ন।' টেকনিক্যাল ক্লাসে কী শেখানো হবে? 'তরল আলতা, গোলাবী বিড়ি, ঘড়ি মেরামত' -চূড়ান্ত অ্যান্টিক্লাইম্যাক্স্ হয়ে তারপর আসে - 'ঘুড়ি মেরামত, দাঁত - বাঁধানো' আবার অ্যান্টিক্লাইম্যাক্স্ - 'ধামাবাঁধানো'।৯

সবশেষে বেচারা পাঁচু মিয়া যখন জগদ্‌গুরুকে জিগেস করেন, 'আমার কি করলেন ধর্মাবতার?' (চোরই এখানে বিচারকের মহিমায় বসে আছেন!) জগদ্‌গুরু বলেন, 'তুমি এখানে এসে ভালো করনি বাপু। তোমার গুড়ু শিয়া থেকে আসবেন, এখন ধৈর্য ধরে থাকো। আর এই সুযোগেই মিষ্টার গুহা পাকড়ান পাঁচু মিঁয়াকে 'দশ হাজার টাকা চাঁদা তুলতে পারিস? ইউনিয়ন খুলে এমন হুড়ো লাগাব যে, এখনই তোদের মজুরি পাঁচগুন হয়ে যাবে।' মিষ্টার গ্রাব সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠেন, 'সাবধান, আমার চটকলের ত্রিসীমানার মধ্যে যেন এসো না'। মিস্টার গুহাও তাতে গড়রাজি নন। তিনি চুপি চুপি জানতে চান আপনার বাড়ি গিয়ে দেখা করব কি? ১৯৪৭ এর পর থেকে একের পর এক রাজনীতিক গল্পে পরশুরামের যে অনাস্থাবাদী (cynic) মনোভাব প্রকাশ পায় ১৯২২ এই তার সূচনা দেখা গিয়েছিল।১০ শ্রমিককে তিনি ছোটো করেন না ঠিকই, কিন্তু 'ইউনিয়ন' বলতে তিনি বোঝান ধান্দাবাজদের কারসাজি - শ্রমিক - দরদী সেজে যারা শ্রমিকদের টাকা মারে, আবারগোপনে মালিকদেরও টাকা খায়। অবিভক্ত বাঙলায় তখন ভারতে সব অ-শ্রমিক ট্রেড - ইউনিয়ন সংগঠকই এমন দুনম্বরি ছিলেন না। কিন্তু পরশুরামের ঝোঁকই সবাইকে একই ছাঁচে ফেলার। তার ফলে এই গল্পেও কোন ইতিবাচক পরিনতি থাকে না ডাইনে - বাঁয়ে সকলকে বিদ্রুপ করেই গল্প শেষ হয়।

আর একটি কথা বলেই এই প্রসঙ্গে দাঁড়ি টানব। গল্পের একেবারে শেষে চতুর্থ শ্রেনীর এক নিষ্কর্মা (এখনকার কথায় বেকার, হিন্দিতে যাকে বলে বে - রোজগার) কাঙালীচরণ জগদ্‌গুরুকে 'দেবতা' বলে সম্বোধন করে, জানতে চান, 'যদি কখনও মহাবিদ্যা ধরা পড়ে যায় তখন অবস্থাটা কিরকম হবে? জগদ্‌গুর এই উত্তরোত্তর মর্যাদাবৃদ্ধি খেয়াল করার মতো প্রথমে তিনি ছিলেন গাঁট্টালাল্‌-এর 'গুজী', মিষ্টার গুহার 'গুদেব', তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রদের কাছে 'স্যার' ও 'গুদেব', চতুর্থ শ্রেণীর কাছে তিনি হলেন 'ধর্মাবতার', সবশেষে 'দেবতা'!

জগদ্‌গুরু অবশ্য কাঙালীচরণের কথায় জবাব দেন না, একটু হেসে বেদি থেকে নেমে পড়েন, ক্লাস শেষের ঘন্টা পড়ে, শোনা যায় কোলাহল। গল্পও শেষ।

কিন্তু শেষের পরেও শেষ থাকে। পরশুরাম সেটি লেখেন নি, তবে এঁকে দেখিয়েছেন শ্রী নারদ অথাৎ যতীন্দ্র কুমার সেন। গল্পের শেষে পাদপূরক ছবি (টেলপিস) - তে আঁকা আছে এক বিরাট হাতকড়া, তার পেছনে জেলখানার গরাদ। ঠিক এরকমই একটি অসাধারন টেলপিস ছিল পরশুরামের প্রথম গল্প, "শ্রী শ্রী সিদ্ধেরী লিমিটেড"-এ ঃ একটি গনেশ টেলপিস ছিল পরশুরামের প্রথম গল্প, "শ্রী শ্রী সিদ্ধেরী লিমিটেড" -এ ঃ একটি গনেশ মূর্তি উল্টে পড়ে আছে। "ভূশন্ডীর মাঠ" -এর টেলপিসটিও খুবই মনোরম, কিন্তু অমন ইঙ্গিতময় নয়। টেলপিস -ই এখানে শেষ কথা বলে। কাঙালীচরনের প্রশ্নের জবাবও দেওয়া হয়।

যেখান থেকে আলোচনা শু করা হয়েছিল। আবার সেখানেই ফেরা যাক। সংলাপের ঢঙে লিখলেই যে কোনো রচনা নাটক হয়ে যায় না। কোনো বিবরন নেই, শুধুই সংলাপ আছে- নাটকের এটা বাহ্যলক্ষন মাত্র। আসলে নাটকের নাটকত্ব থাকে তার আখ্যান (প্লট) -এ অর্থাৎ গল্প সাজানোয়। শু থেকে শেষের মধ্যে যদি কোনো বিকাশ না ঘটে - ঘটনা বা চরিত্রের ক্ষেত্রে এতটুকু বদবদল না হয় - সংলাপ আকারে লিখলেও তা নাটক নয়। আসলে পরশুরামের উদ্দেশ্য ছিল ঃ চুরি ব্যাপারটাকে একটা বিরাট মাত্রায় দেখানো। গ্রামের সিঁধেল চোর থেকে ব্রিটিশ ফরাসি জার্মান ইত্যাদি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কিভাবে লোক ঠকিয়ে নিজেদের ধনদৌলত বাড়ায় তারই তত্ত্ব হাজির করা। একেবারে গোড়ায় প্রথম, দ্বিতীয় ইত্যাদি শ্রেনীর ছাত্ররা একে - একে কথা বলে - কোনো শ্রেনীর ছাত্রদের জন্যেই মিনিটখানেকের বেশি সময় বরাদ্দ হয় নি - তার পর জগদ্‌গুর বক্তৃতা - মাঝে মাঝেই বাধা দিয়ে প্রশ্ন -উত্তর। এতে পরশুরামের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। টানা বক্তৃতার বদলে মাঝেমাঝেই ছেদ দিয়ে ছাত্রদের মন্তব্য শুনিয়ে গল্পটিকে একঘেয়ে হতে দেন না। কিন্তু এর পরিনতি আসে কোন ঘটনার সূত্রে নয়, ক্লাসের ঘন্টা পড়ে যাওয়া স্বাভাবিক কারনেই।১১ এই কৌশলটা পরশুরাম বোধ হয় ভুলে গিয়েছিলেন। যথাযথ ছেদের অভাবেই তার "মাঙ্গলিক" (১৯৫৫) গল্পটি ঠিক লক্ষ্যভেদ করতে পারে না। সেখানে শুধুই এক লম্বা বক্তৃতা চলে- যা অনাটকীয়, একঘেয়ে ও অবিশ্বাস্য।

।। টিকা ।।

১. গব্বের আদৌ কোনো ব্যক্তিনাম ছিল কিনা তা বলা শক্ত। শব্দটির মানে গর মালিক (গো ঈশ্বর)। যে কারনেই হোক, ন

ামটি পরশুরামের পছন্দ হয়েঠিল। তাই নিরীহ স্কুল- শিক্ষককে এই নাম দিয়েছেন। ছাত্র মানেই গ - এ রকম ঈঙ্গিতও থ াকতে পারে।

২. মজার ব্যাপার হলো ঃ আমার দেখা কোনো বাঙলা অভিধানে - হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস, সুবল চন্দ্র মিত্র প্রমুখ - সঙ্কলিত - 'মহাবিদ্যা' অর্থে 'চুরি' দেওয়া নেই এমনকি যোগেশচন্দ্র রায় - এর 'বাঙ্গলা শব্দকোষ' ও খোদ রাজশেখর বসুর 'চলন্তিকা'তেও না। অথচ 'কজ্জলী'-র মতো শব্দ - পরশুরামএর একটি গল্প সঙ্কলনের নাম ছাড়া আর প্র ায় কোথাওই যা ব্যবহার হয় না- 'চলন্তিকা'য় স্থান পেয়েছিল!

৩. তৈলে শঙ্খে তথা দ্বিজে বৈদ্যে জ্যোতিষিকে তথা।

৪. যাত্রায়াং পথি নিদ্রায়াং মহচ্ছব্দ ন দীয়তে।।

৫. একটি গল্প লিখেছিলেন ঃ "মহেশের মহাযাত্রা" এখানে মহাযাত্রা মানেশ্মশান যাত্রা। বোধহয় মহাযাত্রা -রসঙ্গে মিশিয়ে গল্পের মুখ্যচরিত্রের নাম ও মহেশ, আর অনুপ্রাসের ঝোঁকে পদবিও মিত্তির!

৬. এই বিখ্যাত কথাটি প্রুধঁর নামে চলে - তাঁর সম্পত্তি কী? - Quest-ce Que is propriete? (১৮৪০)- এ বাক্যটি অ াছে। এটি কিন্তু প্রথম বলেছিলেন ব্রিসো দ্য ওয়ারভিল (১৭৫৪-৯৩ঃ তাঁর 'সম্পত্তির অধিকার ও চুরি বিষয়ে দার্শনিক অনুসন্ধান..... ?' (১৮৭০)-এ প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো ঃ প্রুধঁ সবরকমের সম্পত্তি অবলোপের পক্ষপাতি ছিলেন ন া বরং খুদে চাষি ও কারিগরদের নিজস্ব যন্ত্রপাতী থাকুক এই ছিল তাঁর ইচ্ছে।Joseph A. Schum peter, History of Economic Analysis. London: George Allen & Unwin, 1955,pp, 139-40, 457-58; Simon Blackbum, the Oxford Dictionary of philosophy, Oxford and ect. Oxford University Press 1994, P.308 দ্র।

৭. বার্নার্ড শ-র 'পিগম্যালিয়ন' নাটকে কর্নেল পিকরিং একবার ডুলিট্ল -কে বলেছিলেন 'তোমার কি কোনো নীতি নেই? উত্তরে ডুলিটল্ বলেছিলেন, Can't afford them, Governor .' 'পোষাতে পারি না, বাবু লুটবিহারীও বোধহয় একই কথা বলতে পারত।

৮.Der Krieg ist nichts anderes als die Fortsetzung der Politik anderer Mitteln, "Karl von Clausewitz, Con Kriege, Band I Berlin, 1902, S. 28 V.I.Lenin, with 4. y. Zinoviev' Socialism and war' (July – august 1915) collected works, Moscow: Progress Publishers, vol, 21. 1964, P. 304.

৯.'They no longer use bullets and ropes. They use the World Bank and the IMF; Jesse Jackson, David Korten :When Corporations Rule the World Mapusa, Goa: The other India Press, 1998, P.158- এ উদ্ধৃত।

১০. স্বদেশী উদ্যোগের নাম করে বিশ শতকের গোড়ায় বিস্তর লোক - ঠকানোর ব্যবসা চালু হয়েছিল। ত্রৈলোক্যনাথ মুখে াপাধ্যায় 'ডম চরিত,' পঞ্চম গল্প ('স্বদেশী কোম্পানী') দ্র.। পরশুরাম নিজেও অবশ্য একটি স্বদেশী উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

১১. প্রসঙ্গত, 'গোলাবী বিড়ি' -র ব্যাপারে ও একটা গুহ্য ইঙ্গিত আছে, মনে হয়। হুতোম 'গোলাপি গিলি'র কথা লিখেছেন। তার টাকায় (সেখানে ছাপা হয়েছে 'গোলাবি') বলা হয়েছে হালকা নেশা হওয়ার জন্যে পানের মশলার সঙ্গে লঘু মাদক মেশানো হতো ('সটীক হুতোম প্যাঁচার নকশা', অন নাগ, কলকাতাঃ সুবর্নরেখা, ১৩৯৮, পৃ, ৫৫

১২. এ বিষয়ে আলোচনার জন্যে 'পরশুরামের রাজনীতিক গল্প ঃ অসমাধানের সমস্যা', শারদীয় 'অর্কিড', ১৯৯৯দ্র

১৩. পরশুরামের "চিকিৎসা - সঙ্কট " গল্পটির নাট্যরূপ দিয়েছিলেন যতীন্দ্র কুমার সেন উৎকেন্দ্র - সমিতি-র সভ্যরা এটি বারকয়েক অভিনয়ও করেছিলেন। "চিকিৎসা - সংকট' গল্পে শুধু মজাদার সংলাপ ও চরিত্রইনেই, একটা নাটকীয় পরিনতিও আছে। এক এক করে নানা চিকিৎসকের চেম্বার ঘুরে নন্দবাবু মিস্ বিপুলা মল্লিকের কাছে আত্মসমর্পন করেন অ ার শেষ পর্যন্ত দুজনের বিয়েও হয়। এধরনের কোন নাট্য - ক্রিয়া (অ্যাক্শন্) কিন্তু "মহাবিদ্যা" গল্পে নেই। তাই সংলাপ - সর্বস্ব হলেও গল্পটিকে কিছুতে নাট্যরূপে ভাবা যায়না। কাহিনীর মধ্যে যেটুকু উৎকণ্ঠা ছিল, তার কোন নাটকীয় পরিনতি আর দেখা যায় না।

সাহিত্য সমাজ থেকে সংগৃহীত